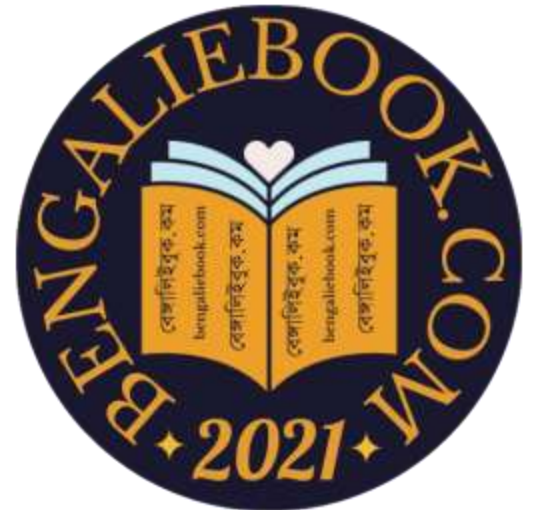


প্রবন্ধ

সহিত

বকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



সঙ্গীত

{ ১২৭৯ সালের বঙ্গদর্শনে সঙ্গীতবিষয়ক তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহার কিয়দংশ ঞ্জগদীশনাথ রায়ের রচিত। অবশিষ্ট অংশ আমার রচনা। যতটুকু আমার রচনা, তাহাই আমি পুনর্মুদ্রিত করিলাম। ইহা প্রবন্ধের ভগ্নাংশ হইলেও পাঠকের বুঝিবার কষ্ট হইবে না। }

সঙ্গীত কাহাকে বলে? সকলেই জানেন যে, সুরবিশিষ্ট শব্দই সঙ্গীত। কিন্তু সুর কি?

কোন বস্তুতে অপর বস্তুর আঘাত হইলে, শব্দ জন্মে; এবং আহত পদার্থের পরমাণুमध्ये কম্পন জন্মে। সেই কম্পনে, তাহার চারি পার্শ্বস্থ বায়ুও কম্পিত হয়। যেমন সরোবরमध्ये জলের উপরি ইষ্টকখণ্ড নিক্ষিপ্ত করিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা সমুদ্ভূত হইয়া চারি দিকে মণ্ডলাকারে ধাবিত হয়, সেইরূপ কম্পিত বায়ুর তরঙ্গ চারিদিকে ধাবিত হইতে থাকে। সেই সকল তরঙ্গ কর্ণमध्ये প্রবিষ্ট হয়। কর্ণमध्ये একখানি সূক্ষ্ম চর্মা আছে। ঐ সকল বায়বীয় তরঙ্গপরম্পরা সেই চর্ম্মোপরি প্রহত হয়; পরে তৎসংলগ্ন অস্থি প্রভৃতি দ্বারা শ্রাবণ স্নায়ুতে নীত হইয়া মস্তিষ্কमध्ये প্রবিষ্ট হয়। তাহাতে আমরা শব্দানুভব করি।

অতএব বায়ুর প্রকম্প শব্দজ্ঞানের মুখ্য কারণ। বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, যে শব্দে প্রতি সেকেন্ডে ৪৮,০০০ বার বায়ুর প্রকম্প হয়, তাহা আমরা শুনিতে পাই, তাহার অধিক হইলে শুনিতে পাই না। মসূর সাবর্তি অবধারিত করিয়াছেন

যে, প্রতি সেকেণ্ডে ১৪ বারের নূনসংখ্যক প্রকল্প যে শব্দে, সে শব্দ আমরা শুনিতে পাই না । এই প্রকল্পের সমান মাত্রা সুরের কারণ। দুইটি প্রকল্পের মধ্যে যে সময় গত হয়, তাহা যদি সকল বারে সমান থাকে, তাহা হইলেই সুর জন্মে। গীত তাল যেরূপ, মাত্রার সমতা মাত্র-শব্দপ্রকল্পে সেইরূপ থাকিলেই সুর জন্মে। যে শব্দে সেই সমতা নাই, তাহা সুররূপে পরিণত হয় না। সে শব্দ “বেসুর” অর্থাৎ গগুগোল মাত্র। তালই সঙ্গীতের সার।

এই সুরের একতা বা বহুত্বই সঙ্গীত। বাহ্য নিসর্গতত্ত্বে সঙ্গীত এইরূপ, কিন্তু তাহাতে মানসিক সুখ জন্মে কেন? তাহা বলি।

সংসারে কিছুই সম্পূর্ণরূপে উৎকৃষ্ট হয় না। সকলেরই উৎকর্ষের কোন অংশে অভাব বা কোন দোষ আছে। কিন্তু নির্দোষ উৎকর্ষ আমরা মনে কল্পনা করিয়া লইতে পারি—এবং এক বার মনোমধ্যে তাহার প্রতিমা স্থাপিত করিতে পারিলে, তাহার প্রতিমূর্তির সৃজন করিতে পারি। যথা, সংসারে কখন নির্দোষ সুন্দর মনুষ্য পাওয়া যায় না; যত মনুষ্য দেখি, সকলেরই কোন না কোন দোষ আছে, কিন্তু সে সকল দোষ ত্যাগ করিয়া, আমরা সুন্দরকান্তিমাত্রেরই সৌন্দর্য্য মনে রাখিয়া, এক নির্দোষ মূর্তির কল্পনা করিতে পারি। এবং তাহা মনে কল্পনা করিয়া নির্দোষ প্রতিমা প্রস্তুত গঠিত করা যায়। এইরূপ উৎকর্ষের চরম সৃষ্টিই কাব্য, চিত্রাদির উদ্দেশ্য।

যেমন সকল বস্তুরই উৎকর্ষের একটা চরম সীমা আছে, শব্দেরও তদ্রূপ। বালকের কথা মিষ্ট লাগে। যুবতীর কণ্ঠস্বর মুগ্ধকর; বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার। বক্তৃতা শুনিয়া যত ভাল লাগে, পাঠ করিয়া তত ভাল লাগে না; কেন না, সে স্বরভঙ্গী নাই। সে কথা সহজে বলিলে তাহাতে কোন রস পাওয়া যায় না, রসিকের কণ্ঠভঙ্গীতে তাহা অত্যন্ত সরস হয়। কখন কখন একটি মাত্র সামান্য কথায়, এত শোক, এত প্রেম বা এত আহ্লাদ ব্যক্ত হইতে শুনা গিয়াছে

যে, শোক বা প্রেম বা আহ্লাদ জানাইবার জন্য রচিত সুদীর্ঘ বক্তৃতায় তাহার শতাংশ পাওয়া যায় না। কিসে এরূপ হয়? কণ্ঠভঙ্গীর গুণে। সেই কণ্ঠভঙ্গীর অবশ্য একটা চরমোৎকর্ষ আছে। সে চরমোৎকর্ষ অত্যন্ত সুখকর হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? কেন না, সামান্য কণ্ঠভঙ্গীতেও মনকে চঞ্চল করে। কণ্ঠভঙ্গীর সেই চরমোৎকর্ষই সঙ্গীত। কণ্ঠভঙ্গী মনের ভাবের চিহ্ন। অতএব সঙ্গীতের দ্বারা সকল প্রকার মনের ভাব প্রকাশ করা যায়।

ভক্তি, প্রেম ও আহ্লাদ-বাচক সঙ্গীত, সকল সময়ে, সকল দেশে, সর্বলোকমধ্যে আছে। কেবল খলতা-ব্যঞ্জক সঙ্গীত নাই। যাহাতে রাগদ্বेषাদি প্রকাশ পায়, সে সকল শব্দ গীতমধ্যে নহে। রণবাদ্য প্রভৃতি আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল বাদ্য হিংসা-প্রবাচক নহে; কেবল উৎসাহবর্দ্ধক মাত্র। কল্পনার দ্বারা আমরা রাগ অহঙ্কার প্রভৃতি খলতাবের বর্ণনা গীতে ভাবসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করি, কিন্তু সে বর্ণনা কল্পনা প্রতিষ্ঠিত মাত্র; বুঝাইয়া না দিলে, বুঝা যায় না। অতএব এ সকল গীত স্বভাবসঙ্গত নহে। শোকপ্রকাশক গীত আছে, গীতমধ্যে তাহা অতি মনোহর। কিন্তু শোক ত্রুরভাব নহে; ভক্তি ও প্রেমবাচক।

অতঃপর রাগ রাগিণী সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। যেমন তেত্রিশটি আদি দেবতা হইতে তেত্রিশ কোটি দেবতা হইয়াছেন, সেইরূপ আদিম ছয় রাগ এবং ছত্রিশ রাগিণী হইতে অদ্ভুত কল্পনার প্রভাবে, অসংখ্য উপরাগ উপরাগিণী পুত্রপৌত্রাদির সহিত হিন্দু সঙ্গীতে বিরাজমান হইয়াছে। এ বড় রহস্য। হিন্দুদিগের বুদ্ধি অত্যন্ত কল্পনা-কুতূলিনী। শব্দার্থমাত্রকেই মানব-চরিত্রবিশিষ্ট করিয়া পরিণত করিয়াছে। প্রাকৃতিক বস্তু বা শক্তিমাত্রেরই দেবত্ব। পৃথিবী দেবী; আকাশ, ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, বায়ু-সকলেই দেব; নদ, নদী, দেব, দেবী। দেব দেবী সকলেই মনুষ্যের ন্যায় রূপবিশিষ্ট; তাহাদের সকলেরই স্ত্রী, স্বামী, পুত্র,

পৌত্রাদি আছে। তর্ক দ্বারা প্রথম সিদ্ধ হইল, যে, এই জগতের সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। তিনি ব্রহ্মা। দেখা যাইতেছে যে, ঘটপটাদির সৃষ্টিকর্তা সাকার, হস্তপদাদিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মাও সাকার। হস্তপদাদিবিশিষ্ট, বেশির ভাগ চতুর্মুখ। তবে তাঁহার একটি ব্রহ্মণীও থাকা চাহি। একটি ব্রহ্মণীও হইল। ঋষিগণ বাহন তাঁহার পুত্র হইলেন; হংস বাহন হইলেন, নহিলে—গতিবিধি হয় কি প্রকারে—ব্রহ্মলোকে গাড়ি পালকির অভাব। কেবল ইহাতেই কল্পনাকারীরা সন্তুষ্ট নহে। মনুষ্যেরা কামক্রোধাদিপরবশ, মহাপাপী। ব্রহ্মাও তাই। তিনি কন্যাহারী।

যেখানে সৃষ্টিকর্তা প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ, —আকাশ, নক্ষত্র, গিরি, নদী প্রভৃতি প্রাকৃতিক পদার্থ—অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি অপ্রমেয় পদার্থ, —প্রাকৃতিক ক্রিয়া, —কামাদি মনোবৃত্তি, —এ সকল মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পুত্রকলত্রাদিযুক্ত, সর্ব বিষয়ে মনুষ্যপ্রকৃতিসম্পন্ন হইলেন, সেখানে সুরসমষ্টি রাগই বা বাদ পড়ে কেন? সুতরাং তাহারাও সাকার, সংসারী, গৃহী হইল। রাগের সঙ্গে সঙ্গে রাগিণী হইল। কেবল যে এক একটি রাগিণী, এমত নহে। রাগেরা কুলীন ব্রাহ্মণ—পলিগেমিষ্ট, এক এক রাগের ছয় ছয় রাগিণী। সঙ্গীতবিদেরা ইহাতেও সন্তুষ্ট নহেন। রাগগুলিকে “বাবু” করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের রাগিণীর উপর উপরাগিণীও হইল। যদি উপরাগিণী হইল, উপরাগ না হয় কেন? তাহাও হইল। তখন রাগ রাগিণী, উপরাগ উপরাগিণী সকলে সুখে ঘরকন্না করিতে লাগিলেন। তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি জন্মিল।

কিন্তু এ কেবল রহস্য নহে। এই রহস্যের ভিতর বিশেষ সার আছে। রাগ-রাগিণীকে আকারবিশিষ্ট করা, কেবল রসিকতামাত্র নহে। শব্দশক্তি কে না জানে? কোন একটি শব্দবিশেষ শ্রবণে মনের একটি বিশেষ ভাব উদয় হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। আবার কোন দৃশ্য বস্তু দেখিয়াও সেই ভাব উদয় হইতে পারে। মনে কর, আমরা কখন কোন শত্রুশোকাতুরা মাতার ক্রন্দনধ্বনিই

শুনিলাম। মনে কর, এস্থলে আমরা রোদনকারিণীকে দেখিতে পাইতেছি না, কেবল ক্রন্দনধ্বনিই শুনিতে পাইতেছি। সেই ধ্বনি শুনিয়া আমাদের মনে শোকের আবির্ভাব হইল। আবার যখন সেইরূপ রোদনানুকারী স্বর শুনিব— আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—সেইরূপ শোকের আবির্ভাব হইবে।

মনে কর, আমরা অন্যত্র দেখিলাম যে, এক পুত্রশোকাতুরা মাতা বসিয়া আছেন। কাঁদিতেছেন না—কিন্তু তাঁহার মুখাবয়ব দেখিয়াই, তাঁহার উৎকট মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে পারিলাম। সেই সন্তাপক্লিষ্ট ম্লান মুখমণ্ডলের অভিব্যক্তি আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত রহিল । সেই অবধি, যখন আবার মুখমণ্ডল দেখিব, তখন আমাদের সেই শোক মনে পড়িবে—হৃদয়ে সেই শোকের আবির্ভাব হইবে।

অতএব সেই ধ্বনি, এবং সেই মুখের ভাব, উভয়ই আমাদের মনে শোকের চিহ্নস্বরূপ। সেই ধ্বনিতে সেই শোক মনে পড়ে। মানস প্রকৃতির নিয়মানুসারে ইহার আর একটি চমৎকার ফল জন্মে। শব্দ, এবং মুখকান্তি, উভয়ই শোকের চিহ্ন বলিয়া পরস্পরকে স্মৃতিপথে উদ্দীপ্ত করে। সেইরূপ শব্দ শুনিলেই, সেইরূপ মুখকান্তি মনে পড়ে; সেইরূপ মুখ দেখিলেই, সেইরূপ শব্দ মনে পড়ে। এইরূপ ভূয়োভূয়ঃ উভয়ে একত্র স্মৃতিগত হওয়াতে, উভয়ে উভয়ের প্রতিমাস্বরূপে পরিণত হয়। সেই শোকব্যঞ্জক মুখাবয়বকে সেই শোকসূচক ধ্বনির সাকার প্রতিমা বলিয়া বোধ হয়।

ধ্বনি এবং মূর্তির এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধাবলম্বন করিয়াই প্রাচীনেরা রাগ রাগিণীকে সাকার কল্পনা করিয়া, তাঁহাদিগের ধ্যান রচনা করিয়াছেন। সেই সকল ধ্যান, প্রাচীন আর্য্যদিগের আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি ও কল্পনাশক্তির পরিচয়স্থল। আমরা

পূর্বপুরুষদগের কীর্তি যতই আলোচনা করি, ততই তাঁহাদিগের মহানুভাব দেখিয়াই চমৎকৃত হই।

দুই একটি উদাহরণ দিই। অনেকেই টোড়ি রাগিণী শুনিয়াছেন। সহৃদয় ব্যক্তির তচ্ছবণে যে একটি অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হইয়েন, তাহা সহজে বক্তব্য নহে। সচরাচর যাহাকে করিয়া “আবেশ” বলিয়া থাকেন, তাহা ঐ ভাবের একাংশ—কিন্তু একাংশমাত্র। তাহার সঙ্গে ভোগাভিলাষ মিলিত কর। সে ভোগাভিলাষ নীচপ্রবৃত্ত নহে। যাহা কিছু নিম্নল সুখকর, অন্যজনের অসাপেক্ষ, কেবল আধ্যাত্মিক, সেই ভোগেরই অভিলাষ। কিন্তু সে ভোগাভিলাষের সীমা নাই, তৃপ্তি নাই, রোধ নাই, শাসন নাই। ভোগে এবং ভোগসুখে অভিলাষ আপনি উছলিয়া উঠিতেছে। আকাঙ্ক্ষা বাড়িতেছে। প্রাচীনেরা এই টোড়ি রাগিণীর মূর্তি কল্পনা করিয়াছেন, সে পরমাসুন্দরী যুবতী, বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা, কিন্তু বিরহিণী। আকাঙ্ক্ষার অনিবৃত্তিহেতুই তাহাকে বিরহিণী কল্পনা করিতে হইয়াছে। এই বিরহিণী সুন্দরী বনবিহারিণী, বনমধ্যে নিৰ্জনে একাকিনী বসিয়া মধুপানে উন্মাদিনী হইয়াছে, বীণা বাজাইয়া গান করিতেছে, তাহার বসন ভূষণ সকল স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, বনহরিণীসকল আসিয়া তাহার সম্মুখে তটস্থভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

এই চিত্র অনির্বচনীয় সুন্দর—কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন ইহার আর এক চমৎকার গুণ আছে। ইহা টোড়ি রাগিণীর যথার্থ প্রতিমা। টোড়ি রাগিণী শ্রবণে মনে যে ভাবের উদয় হয়, এই প্রতিমা দর্শনে ঠিক সেই ভাব জন্মিবে।

এইরূপ অন্যান্য রাগ রাগিণীর ধ্যান। মুলতানী, দীপক রাগের সহধর্ম্মিণী, দীপকের পার্শ্ববর্ত্তিনী, রক্তবস্ত্রাবৃত গৌরাঙ্গী সুন্দরী। ভৈরবী শুক্লাম্বরপরিধানা নানালঙ্কারভূষিতা—ইত্যাদি।

এই সকল ধ্যান সম্বন্ধে যে মতভেদ আছে, তাহার সন্দেহ নাই। যখন বৈজ্ঞানিক বৃত্তান্তেই পণ্ডিতদিগের মতের অনৈক্য, তখন কল্পনামাত্রপ্রসূত ব্যাপারে নানা মুনির নানা মত না হইবে কেন? কেবল চক্ষু মুদিয়া, ভাবিয়া, মন হইতে অলঙ্কারের সৃষ্টি করিতে থাকিলে, অলঙ্কারসম্বন্ধে মতভেদ হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কতকগুলিন ভাবের উদয় হয়, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। তর্কিকেরা বলিতে পারেন যে, কোমল সুরে যদি শোকও বুঝায়, প্রেমও বুঝায়, উন্মাদও বুঝায়, তবে স্বরভেদ দ্বারা একটি ভাবই কি প্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে? উত্তর, সে উপলব্ধি কেবল সংস্কারাধীন। আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য উপলব্ধ হইতে পারে। সামান্য অভ্যাসে, বালকেরা সানাই শুনিলে নাচে, হাইলণ্ডেরেরা বাগ্‌পাইপে গা ফুলায়, এবং প্রাচীন হিন্দুরা আগমনী শুনিলে কাঁদেন। এই অভ্যাস বন্ধমূল এবং সুশিক্ষায় পরিণত হইলে, ভাবসঞ্চয়ের আধিক্য জন্মে, পুঞ্জানুপুঞ্জ অনুভব করিতে পারা যায়। শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক। কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভাল লাগে—স্বাভাবিক ভাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না। অভ্যাসশূন্য ব্যক্তি যেমন পলাঙুভোজনে বিরক্ত, অশিক্ষিত ব্যক্তি তেমনি উৎকৃষ্টতর সঙ্গীতে বিরক্ত। কেন না, উভয় অভ্যাসাধীন। সংস্কারহীন ব্যক্তি রাগ-রাগিণী-পরিপূর্ণ কালোয়াতি গান শুনিতে চাহেন না, এবং বহুমিলনবিশিষ্ট ইউরোপীয় সঙ্গীত বাঙ্গালীর কাছে অরণ্যে রোদন। কিন্তু উভয় স্থানেই, অনাদরটি অসম্ভ্যতার চিহ্ন বলিতে হইবে। যেমন রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি সকল মনুষ্যেরই জানা উচিত, তেমন শরীরার্থ স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম, এবং চিত্তপ্রসাদার্থ মনোমোহিনী সঙ্গীতবিদ্যাও সকল ভদ্রলোকের জানা কর্তব্য। শাস্ত্রে রাজকুমার রাজকুমারীদের

অভ্যাসোপযোগী বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত প্রধান স্থান পাইয়াছে। বাঙ্গালীর মধ্যে ভদ্রপৌরকন্যাদিগের সঙ্গীত শিক্ষা যে নিষিদ্ধ বা নিন্দনীয়, তাহা আমাদের অসভ্যতার চিহ্ন। কুলকামিনীরা সঙ্গীতনিপুণা হইলে, গৃহমধ্যে এক অত্যন্ত বিমলানন্দের আকর স্থাপিত হয়। বাবুদের মদ্যাসক্তি এবং অন্য একটি গুরুতর দোষ অনেক অপনীত হইতে পারে। এতদেশে নিম্নলি আনন্দের অভাবই অনেকের মদ্যাসক্তির কারণ—সঙ্গীতপ্রিয়তা হইতেই অনেকের বারম্বারবশ্যতা জন্মে।